একাদশ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ

১১.১ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা—জাতীয়তাবাদী ইতিহাস

স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে জোরালো ও বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যাটি হল জাতীয়তাবাদী। রমেশচন্দ্র মজুমদার, তারাচাঁদ, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, বি. আর. নন্দা, এস. আর. মেহরোত্রা সকলে স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এদের মধ্যে সাধারণ ঐক্যসূত্র হল এই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী এবং চরিত্রে জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যায় জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উত্থানের ওপর। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমি ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বেঙ্গলি* পত্রিকায় লিখেছিলেন যে 'মধ্যবিত্তের অর্থ হল জ্ঞানদীপ্তি, স্বাধীনতা, প্রগতি ও সমৃদ্ধি'। এঁদের মতে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আগে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা ছিল না। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বিপানচন্দ্র উভয়ে জানিয়েছেন যে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে অনেকগুলি জাতি তৈরি হয়েছিল, ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি ছিল না। উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে ভারতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানে অর্থনীতির তেমন ভূমিকা ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি এর উত্থানে সহায়ক হয়েছিল। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তি ছিল জমি, পেশা ও বাণিজ্য। পশ্চিমি শিক্ষা, সাংবিধানিক সংস্কার, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভোটাধিকারের প্রবর্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মহারাষ্ট্রের পার্সি ও চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং মাদ্রাজের ব্রাহ্মণরা ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা। পরে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও পাঞ্জাবে বুদ্ধিজীবীরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ভারতে সদ্যোজাত ইংরেজি শিক্ষিত পশ্চিমি ভাবধারায় পুষ্ট মধ্যবিত্ত এই জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল। এরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও জীবনযাত্রায় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এরা 'এক দেশ, এক জাতি'র ধারণা প্রচার করেছিল। জনগণ এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছিল, জনমানসে জাতীয়তাবাদ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

Scanned with CamScanner

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদীদের দাবি মানেনি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসন এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সদাশয় স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করেছিল, এতে ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি হয়নি। মধ্যবিত্ত নেতারা কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসীদের জাতীয় আন্দোলনে সামিল করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষের মধ্যে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, জাতীয়তাবাদী নেতারা এই ভীতি থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন তাঁদের আন্দোলন হল রাজনৈতিক, নৈতিক ও আদর্শবাদী। জার্মান, ইতালিয়ান ও আইরিশ আন্দোলনের মতো এটি ছিল এক অর্থে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভারতের সাংস্কৃতিক সত্তা বজায় রাখা ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য।

জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন এই আন্দোলন ছিল সর্বজনীন, ব্যাপক ও সর্বাত্মক, ভারতের সর্বস্তরের মানুষ এতে সামিল হয়েছিল, সব প্রদেশ, সব অঞ্চল, সর্ব ধর্মাবলম্বী মানুষ এতে যোগ দিয়েছিল। একথা ঠিক অনেক সময় স্থানীয় বিষয় নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু জাতীয় লক্ষ্য কখনও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়নি। জাতীয় আন্দোলনে অনেক সময় পরস্পরবিরোধী জাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক গোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনে নিজের আদর্শবাদ চাপানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য জাতীয় মুক্তির কথা কেউ বিস্মৃত হয়নি। আন্দোলনের চরিত্র ও কর্মপন্থা নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, স্বাধীন ভারতের অবস্থা কী হবে তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলেছে, কিন্তু এসব বিতর্ক জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলেনি। জাতীয়তাবাদীরা স্বীকার করে নেন যে জাতীয় আন্দোলনে অনেকগুলি ধারা একই সঙ্গে প্রবহমান ছিল। শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন চলেছিল। জাতীয় আন্দোলন একইসঙ্গে নরমপন্থী ও চরমপন্থী—প্রগতিশীল, গোঁড়া, রক্ষণশীল, বুর্জোয়া, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী সকলে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জাতীয় আন্দোলন ছিল একটি বিশাল মঞ্চ যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল একারণে এর জাতীয় চরিত্র কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য হল এই স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল ভারতীয় চিন্তাবিদদের প্রচারিত মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এইসব মূল্যবোধের বাস্তবায়ন। এই মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যক্তির অধিকার, গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে তারা সকলের সমতার আদর্শ ঘোষণা করেন। তাঁরা শ্রেণি সংঘাতের কথা বলেননি কারণ এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত

ছিল বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সামাজিক শ্রেণি যেমন জমিদার, মহাজন, বুর্জোয়া, পেশাদারি মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী। উনিশ শতকে ইউরোপীয় উদারনীতিবাদীরা যেসব আদর্শ প্রচার করেছিলেন জাতীয়তাবাদীরা সেগুলিকে গ্রহণ করেন। এগুলি হল মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংগঠিত হবার অধিকার ইত্যাদি। পৃথিবীর সমকালীন অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অনেকবেশি উদার, মানবিক ও প্রগতিশীল বলে দাবি করা হয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলন জনগণের দারিদ্র্যের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল। অর্থনৈতিক নিষ্কাশন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এবং শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতাকে এজন্য দায়ী করা হয়। জাতীয় আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা সামাজিক উন্নতির কথা বলেনি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিল। অনেকে এমন কথাও বলেছেন জাতীয় আন্দোলন ছিল শিল্পায়নের জন্য আন্দোলন। বলা হয়েছে জাতীয় নেতারা উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করে জাতীয় নেতারা শিল্পায়ন ঘটাতে চাননি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা প্রচার করা হয়। সরকারের কাছে করভার হ্রাস, ঋণ মকুব এবং কৃষি ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। জনগণের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। গান্ধিজি থেকে সমাজতন্ত্রী সকলে কৃষি অর্থনীতির সংস্কারের প্রস্তাব দেন।

জাতীয় আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করেছিল। জাতীয় নেতারা জানতেন যে ভারতে বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। এজন্য তারা ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতাকে কখনও স্বীকার করা হয়নি। জনগণের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীজাতির উন্নতি, স্বনির্ভরতা, মদ্যপান নিবারণ, শিক্ষাবিস্তার, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ইত্যাদি। জাতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো আঞ্চলিক, স্থানীয় বা সংকীর্ণ ছিল না, তাঁরা উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র মানবসমাজের কথা ভেবেছিলেন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছিলেন। পৃথিবীর অন্যত্র মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন জাতীয় নেতাদের সমর্থন লাভ করেছিল। বিভিন্ন দেশের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী কিন্তু এর মধ্যে জাতীয় বিদ্বেষ ছিল না। জাতি হিসেবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ

Scanned with CamScanner

তৈরি হয়নি, এজন্য অনেক ইংরেজ জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন উন্নততর স্তরে পৌঁছেছিল, উগ্র সংকীর্ণ জঙ্গিবাদ একে স্পর্শ করেনি, প্রভাবিত করেনি।

জাতীয় আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার অনেক সমালোচনা হয়েছে। সমালোচকরা বলেছেন এই আন্দোলন ছিল উচ্চবর্গীয়, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র জাতির স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তারা আন্দোলন গড়ে তোলেনি। এদের মতে, জাতীয় আন্দোলন ছিল বিভক্ত ও দুর্বল। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ছিল না। সমগ্র আন্দোলনটি ছিল বিভক্ত, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক। গোড়া থেকে এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। এই দুর্বলতার কারণ হল বহু ধরনের স্বার্থগোষ্ঠী এর মধ্যে স্থান পেয়েছিল, এদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বলা হয় প্রথমপর্বে জমিদার শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা চলেছিল, শেষপর্বে বুর্জোয়াদের। এসব বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অবস্থান জাতীয় আন্দোলনের ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, এর লক্ষ্য সবসময় অপরিবর্তিত ছিল। পৃথিবীর অন্যত্র জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বহু স্বার্থগোষ্ঠীর সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। ইতালির জাতীয় আন্দোলনে বহু সামাজিক গোষ্ঠী হয় উদাসীন ছিল, নয় জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতায় নেমেছিল। জার্মানির স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকরা উৎসাহ সহকারে যোগ দেয়নি।

সাবলটার্ন ঐতিহাসিকরা জাতীয় আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এদের মতে, এই আন্দোলন ছিল উচ্চকোটির মানুষের, একে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলন বলা যায় না। ভারতে সত্যিকারের স্বাধীনতা আন্দোলন করেছে নিম্নকোটির মানুষজন। আদিবাসী, শ্রমিক, কৃষক, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ দেশি ও বিদেশি শোষকদের বিরুদ্ধে একইসঙ্গে সংগ্রাম করেছে। সাবলটার্ন ঐতিহাসিকরা বলেছেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা শ্রমিক ও কৃষকদের ভয় পেতেন। নিম্নকোটির মানুষজন নিয়ে সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে বড়ো ধরনের গণ আন্দোলন তাঁরা গড়ে তোলেননি। এর ফল হল ভয়ংকর—দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে লিগ নেতারা সাম্প্রদায়িকতা ও বিভাজনের বীজ বপন করেছিল। জাতীয় নেতাদের ব্যর্থতার জন্য স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশে দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও রক্তপাত দেখা দিয়েছিল। এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন একথা ঠিক নয়। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বহু স্বার্থগোষ্ঠীর লোক ছিল। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন কোনো স্বার্থগোষ্ঠী ক্ষুণ্ণ হলে জাতীয় আন্দোলন

বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। এই কারণে জাতীয় নেতারা খুব সাবধানে কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, উগ্রপন্থা পরিহার করে চলেন। একথা ঠিক জাতীয় নেতাদের প্রয়াস সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতা জাতির মানসলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এজন্য উগ্র, গোঁড়া, রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা অনেকখানি দায়ী ছিলেন। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা আজও বহু মানুষের সমর্থন পেয়ে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যে চারটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে এটিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন।

১১.২ সাম্রাজ্যবাদী কেম্ব্রিজ ব্যাখ্যা

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গোষ্ঠী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ব্যাখ্যাটি কেম্ব্রিজ ব্যাখ্যা নামে পরিচিত। বি. এল. নেমিয়ারের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ছিল। কেম্ব্রিজ গোষ্ঠী এই তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী ব্যাখ্যা এরা সমালোচনা করে বাতিল করে দিয়েছেন। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যাকে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। এদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রিটিশ রাজের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব এবং তাকে ঘিরে প্রদেশ, অঞ্চল ও শহরে ক্ষমতাকেন্দ্রিক আন্দোলন। এদের মতে, ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বলে কিছু ছিল না, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি। ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণা এবং এই ধারণাকে ঘিরে জাতীয় আবেগ তৈরি হয়নি। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী শাসনের সুবিধার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করলে এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্থানীয় আন্দোলনের জন্ম হয়। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ারদিকে সরকার রাজস্ব ও আনুগত্য নিয়ে স্থানীয় প্রধানদের শাসন ক্ষমতায় রেখেছিল। স্থানীয় প্রধানরা শাসনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এই ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়, কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয়ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রদেশ, অঞ্চল, গ্রাম ঘিরে সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়েছিল অধিক রাজস্ব, ভালো শাসন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থে, সরকার এধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হল উনিশ শতকের শেষদিক থেকে সরকার প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির ফলে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল কারণ প্রাক্তন প্রধানরা ক্ষমতাচ্যুত হন। সরকার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

Scanned with CamScanner

ঘটিয়ে এবং জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে বিক্ষোভ সামলানোর চেষ্টা করেছিল। রিজলির মতো আমলা বিভাজন ও শাসনের নীতি অনুসরণ করে জাতি, বর্ণ ও ধর্মভিত্তিক সামাজিক গোষ্ঠী গঠন করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়েছিল। এই নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপিত হলে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, পৃষ্ঠপোষক ও পোষিতের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, একেই বলা হয়েছে জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ কখনও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেনি, ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদের লড়াই হয়নি। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতের এই তথাকথিত জাতীয় আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্ন, স্থানীয়, প্রাদেশিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষিত উচ্চকোটির মানুষ নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, জনগণের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষা করার কথা তাদের মনে হয়নি। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আসল কারণ হল ক্ষমতা। গান্ধিজির তথাকথিত জাতীয় আন্দোলন এইসব বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা অল্পকালের জন্য দমন করে রাখলেও পরে এদের প্রকাশ ঘটেছিল।

কেম্ব্রিজ ব্যাখ্যার মূল প্রতিপাদ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন কেন্দ্র, প্রদেশ ও অঞ্চল ঘিরে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছিল। এদের ঘিরে এদেশীয়রা সমান্তরাল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমান্তরাল এদেশি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হল জাতীয়তাবাদ, এর মধ্যে আদর্শবাদের কোনো স্থান ছিল না। কেম্ব্রিজের অধ্যাপকরা এই তত্ত্বটি গড়ে তুলেছেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল জন গ্যালাহর, গর্ডন জনসন, অনিল শীল, ডি. এ. ওয়াশব্রুক, ফ্রান্সিস রবিনসন, সি. জে. বেকার এবং সি. এ. বেইলি। এদের বক্তব্য হল ক্ষমতা ঘিরে এবং ক্ষমতার ভাগ পেতে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এই ক্ষমতা অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে শাসিত জনগণের বিচ্ছেদ ঘটেনি, সংঘাত ঘটেনি। প্রদেশ, অঞ্চল ও গ্রাম হল ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্র। গোড়ারদিকে ব্রিটিশ শাসক আঞ্চলিক বা গ্রামস্তরে হস্তক্ষেপ করেনি, ক্ষমতা ছিল স্থানীয় প্রধানদের হাতে। ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করলে ভারতীয়রা নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সমান্তরাল স্থানীয় সংগঠন এদেশিরা গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক সংস্কারসমূহ এদেশিদের গ্রাম থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছিল। এভাবে ভারতীয়রা ভারতীয় রাজনীতির রূপান্তর ঘটিয়েছিল। জন গ্যালাহর এধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিক্ষোভ, আন্দোলন, নির্বাচন, রাজনীতি সবকিছু পরিচালনার জন্য এসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হত।

গ্রাম ও স্থানীয় অঞ্চলে নানা ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ছিল, সামাজিক গোষ্ঠীগুলি নানাকারণে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত সংস্কার আইনগুলি ভারতের রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বেকার জানিয়েছেন যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংস্কার আইনের জন্য গান্ধিজির পক্ষে ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সাইমন কমিশন গঠিত হলে গান্ধিজির পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থ হলে গান্ধিজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন। গর্ডন জনসন বলেছেন ভারতে কালানুক্রমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা যায় না। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন সরকার সংস্কার প্রবর্তন করলে সাংবিধানিক উদ্যোগ নিলে ভারতে আন্দোলন হয়েছে। সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিলে জাতীয়তাবাদীরা তাকে ঘিরে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ভারতের মুক্তি কামনায় সর্বভারতীয় আন্দোলন হয়নি। অনিল শীল মনে করেন গ্রামাঞ্চলে ও আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণ হল প্রাধান্য, মর্যাদা ও সম্পদের ওপর অধিকার স্থাপনের ইচ্ছা। ধনীরা অর্থ জোগাতেন। জাতীয়তাবাদীরা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নন, পেশাদার মানুষ নন, তাঁরা হলেন ক্ষমতার ঠিকাদার (Contractors and sub-contractors of power)। কেম্ব্রিজ তত্ত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এই ব্যাখ্যা একপেশে, পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট, নেমিয়ার দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। রাজনীতিতে বহু ধরনের স্বার্থের যে সহাবস্থান ছিল তার উল্লেখ এতে নেই। ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে এই আন্দোলনের স্রষ্টা কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা তা স্বীকার করেননি। ব্রিটিশ প্রশাসনিক পরিবর্তন হল জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের মূলকথা। ভারতের ঐতিহ্য, জনমত, দেশের প্রতি জনগণের গভীর মমত্ববোধ, সংস্কৃতির নবজাগরণ সবকিছুকে তারা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা সমালোচনা করে বাতিল করেছেন। যারা একাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, তপন রায়চৌধুরী ও রজত রায়।

১১.৩ মার্কসবাদী ব্যাখ্যা

জাতীয় আন্দোলনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে একটি শ্রেণিভুক্ত করা হলেও এর মধ্যে দুটি স্তর লক্ষ করা যায়। এই দুটি স্তর হল গোঁড়া মার্কসবাদী এবং মার্কসবাদী। প্রথম ধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় ও রজনীপাম দত্ত, দ্বিতীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত করা যায় বিপানচন্দ্র ও সুমিত সরকারকে। মানবেন্দ্রনাথ রায় হলেন গোঁড়া মার্কসবাদী। তাঁর মতে, সারা পৃথিবীতে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার একটি স্তরে অবস্থিত হল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভারত পৃথিবীর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

Scanned with CamScanner

সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল। ভারতে এই অর্থনীতি নির্ভর যে বুর্জোয়া শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তারা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছিল না, তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়নি। ভারতে প্রলিতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি, এরাই জাতীয় আন্দোলনকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। তিনি বলেছেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আগে ঐক্যবদ্ধ জাতির ধারণা বা জাতীয়তাবাদ ছিল না। ভারতে বুদ্ধিজীবীরা জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসারে নেতৃত্ব দিয়েছিল, এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বাণিজ্য ও পেশা থেকে সচ্ছল হয়ে উঠেছিল। বুর্জোয়ারা তাদের অর্থ বিনিয়োগের জন্য ক্ষেত্র অনুসন্ধান করেছিল, এই বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারতে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, ভারতের জাতীয়তাবাদ হল রাজনৈতিক, উদীয়মান বুর্জোয়াদের আদর্শ হল এই জাতীয়তাবাদ। নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বুর্জোয়ারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

রজনীপাম দত্ত অনেকটা একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন, এদের চিন্তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। তার মতে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে আধুনিক শিল্প স্থাপিত হয়, ভারতের বুর্জোয়ারা এর প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ভারতের শিল্পায়ন এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসারে সহায়ক হয়, আইনজীবী, প্রশাসক, শিক্ষক ও সাংবাদিকরা এই শ্রেণির শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। আধুনিককালে অধ্যাপক এ. আর. দেশাই, রজনীপাম দত্তের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন যে শিল্পায়নের ফলে ভারতে উদ্যোগী বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হয়, ভারতের পেশাদার শ্রেণির সম্প্রসারণ ঘটে, এরা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। সোভিয়েত ঐতিহাসিকরা মনে করেন কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী পর্বে বুর্জোয়ারা জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নরমপন্থী পর্বে বুর্জোয়ারা খানিকটা দুর্বল ছিল, চরমপন্থী পর্বে পুঁজিপতিরা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল, দৃঢ়তার সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের সকলে অর্থনৈতিক মাপকাঠি ব্যবহার করে জাতীয় আন্দোলনের ব্যাখ্যা করতে চান না। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক বিপানচন্দ্র ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্য হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে সর্বশ্রেণির ভারতবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ভারতের বুদ্ধিজীবীরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র অনুধাবনে মোটেই ভুল করেননি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আদর্শবাদের তারাই হল স্রষ্টা। বিপানচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণি ছিল তবে জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন ও পরিচালনায় শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর বুর্জোয়াদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল না। জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বুদ্ধিজীবীরা শুধু বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেনি, সর্বশ্রেণির ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা কাজ করেছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুঁজিবাদী কারণ তারা মনে

করেছিল এই পথেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। তারা পুঁজিবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেনি, প্রথম মহাযুদ্ধের পর পুঁজিপতিদের কাছ থেকে তারা কিছু অর্থ সাহায্য পেয়েছিল।

অধ্যাপক সুমিত সরকার, রজনীপাম দত্ত ও সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের শ্রেণি দ্বন্দ্ব দিয়ে জাতীয় আন্দোলন ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সরকার মনে করেন না ভারতের পুঁজিপতিদের জাতীয় আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাঁর মতে, মার্কসীয় পদ্ধতি শুধু অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন করে না, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের মূল্যায়নে সহায়ক হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের পক্ষ নিলে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী প্রেক্ষিত স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৩০ দশকে কংগ্রেস যে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি নিয়েছিল তাতে এই চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে। সরকার মনে করেন মার্কসীয় পদ্ধতিতে জাতীয় আন্দোলনের বিশ্লেষণ নতুন মাত্র যোগ করেছে। মার্কসবাদীরা ভারতীয় সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন—ভূস্বামী, উদীয়মান বুর্জোয়া, বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ প্রলিতারিয়েত, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী। মার্কসবাদীদের এই সামাজিক ব্যাখ্যা জাতীয় আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছে। মার্কসবাদীরা কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের কাজে এগিয়ে এসেছেন, জাতীয় আন্দোলন বৃহত্তর, ব্যাপক ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৩০ দশকে মার্কসবাদীদের প্রভাবে জাতীয় আন্দোলন জমিদারি ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও পরে উচ্ছেদ দাবি করেছে। দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার দাবি উঠেছে। মার্কসবাদী চিন্তাধারা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আসন লাভ করেছে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক সরকার মনে করেন শুধু অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে জাতীয় আন্দোলনের বিচারবিশ্লেষণ করা ঠিক নয়। মার্কসবাদ সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পুঁজিবাদের উত্থানের যোগ আছে বলে তিনি মনে করেন। মার্কসবাদীরা জাতীয় আন্দোলনের অনেকগুলি সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। গণ-আন্দোলন গঠনে ও পরিচালনায় জাতীয় নেতাদের অনীহা ছিল। আন্দোলনের ব্যাখ্যায় মার্কসবাদীরা সচেতনতা, মানসিকতা ও সংস্কৃতির ওপর জোর দেন, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদিকে ব্যবহার করে তারা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন।

১১.৪ সাবলটার্ন ব্যাখ্যা

ভারত ইতিহাসচর্চায় আধুনিকতম সংযোজন হল সাবলটার্ন ব্যাখ্যা। এই চর্চার সূচনা করেন অধ্যাপক রণজিৎ গুহ, এই ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য, পদ্ধতি, সূচি তিনি নির্মাণ করে

Scanned with CamScanner

দেন। ইতালির মার্কসবাদী দার্শনিক এন্টোনিও গ্রামশি তাঁর 'প্রিজন নোট বুকস'-এ সাবলটার্ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এর আভিধানিক অর্থ হল সৈন্যবাহিনীর নিম্নপদের অফিসার। এখানে তিনি সাবলটার্ন বলতে নিম্নবর্গের মানুষ বা প্রলিতারিয়েত বুঝিয়েছেন। গ্রামশি তাঁর নোট বুক-এ এই সামাজিক শ্রেণির মানসিকতা, আচার-আচরণ ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধির ওপর জোর দেন। উচ্চবর্গের ইতিহাসের সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাসের মৌল পার্থক্য রয়েছে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল প্রভু ও অধীনস্থের। অধ্যাপক রণজিৎ গুহ তাঁর দুখানি প্রবন্ধ *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অব পেজান্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* এবং *প্রোজ অব কাউন্টার ইনসারজেন্সি*-তে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নিম্নবর্গের ভূমিকা নির্ধারণ করা হল নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ। তাঁর মতে, রাজনীতিতে আসল নায়ক হল নিম্নবর্গ, কিন্তু সমস্যা হল উচ্চবর্গের মানুষ এযাবৎকাল ইতিহাস লিখেছেন, ইতিহাসের মালমশলা তাঁরাই সরবরাহ করেছেন। সেজন্য তাদের লেখা ইতিহাস হয়েছে একপেশে, নিম্নবর্গের ইতিহাস উপেক্ষিত হয়েছে।

ইতিহাসচর্চায় উচ্চবর্গের পক্ষে একটি আদিকল্প তৈরি হয়েছে। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক এটি ভেঙে দিয়ে নতুন আদিকল্প গড়ে তুলবেন। ভারতের ঔপনিবেশিক যুগে রাজনীতি ঐক্যবদ্ধ ছিল না, ছিল দ্বিধাবিভক্ত। এর মধ্যে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতির স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ করা যায়। স্বতন্ত্র হলেও এই ধারা দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, কখনও দেখা যায় সহযোগিতা, কখনও বিরোধ। উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক তুলে ধরতে হবে। নিম্নবর্গের মানুষ হল কৃষক, শ্রমিক, শহুরে জনতা, আদিবাসী, নিম্নশ্রেণির মানুষ ও মহিলা। গুহ উচ্চবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিদেশি শাসক, বণিক, পুঁজিপতি, দেশি অভিজাত, বণিক, বুর্জোয়া ও উচ্চস্তরের মানুষদের। রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক শাসনকালকে ধরে তাঁর বক্তব্যকে প্রসারিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল জাতীয়তাবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী কোনো ব্যাখ্যাই নিম্নবর্গের মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেনি। জাতীয়তাবোধের বিকাশ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে উচ্চবর্গের কর্মকাণ্ড বলে দেখানো হয়েছে। এই ধরনের আদিকল্প ভ্রান্তিমূলক কারণ নিম্নবর্গের মানুষের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি এখানে নেই। রাওলাট সত্যাগ্রহ বা ভারত ছাড় আন্দোলনে জনগণের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরা হয়নি। জনগণের বেশিরভাগ হল নিম্নবর্গের মানুষ, তাদের বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা হলে তা অবশ্যই একপেশে হয়, অসম্পূর্ণ থাকে।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সম্পর্ক হল শোষক ও শোষিতের,

উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দরিদ্র মানুষের মজুরি, খাজনা, ঋণ, দারিদ্র্য, বেকারি, জমি হারানো, ফসলের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এগুলি হল নিম্নবর্গের ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক হল ক্ষমতার সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস হল রাজনৈতিক ইতিহাসের অঙ্গ। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা কৃষকের শোষণ, বঞ্চনা, প্রতিরোধ, ও প্রতিবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। সাবলটার্ন ইতিহাসের বেশিরভাগ জুড়ে আছে কৃষকের শোষণ, দারিদ্র্য ও বিদ্রোহের কথা। গুহ কৃষক চৈতন্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কৃষকের জীবনযাত্রা, উপকথা, পুরাণ, জনশ্রুতি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার সবকিছু মিলে চৈতন্য গড়ে তোলে। অনেকসময় দেখা যায় তাদের চৈতন্যের স্তরে অনেককিছু আছে যা অলীক, অবাস্তব চিন্তাভাবনা ঢুকে পড়েছে। তারা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার মতো সামর্থ্য তাদের নেই।

নিম্নবর্গের ইতিহাস হল তলদেশ থেকে দেখা ইতিহাস। ইউরোপে এধরনের ইতিহাস লেখার চল হয়েছিল, ক্রিস্টোফার হিল, এডওয়ার্ড টমসন, এরিক হবসবম এধরনের ইতিহাস লিখেছেন। নিম্নবর্গের মানুষ শহুরে জনতা, দস্যু, উদ্‌বাস্তু, ভবঘুরে, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের ইতিহাস লেখা হয়। সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল কৃষক চর্চাকে কেন্দ্র করে। কৃষক হল স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, সৃজনশীল ও বিশিষ্ট চৈতন্যের অধিকারী। নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখেছেন উচ্চবর্গের মানুষ, নানা প্রতিষ্ঠান, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস গড়ে ওঠে। এজন্য উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠানগুলি জানার ঝোঁক তৈরি হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ, চিকিৎসা কেন্দ্র, সংবাদপত্র, শিল্প উৎপাদন, শ্রম সরবরাহ, বিজ্ঞান সংস্থা সবই এখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। সাবলটার্ন ঐতিহাসিকরা আরো অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থান নিম্নবর্গের ইতিহাসে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ রাজনীতি করে, জাতিভেদ প্রথাকেও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের নারী সমাজের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়েছে, এটাও তাদের গবেষণার বিষয়।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা উচ্চবর্গের কর্তৃত্বকে বরবাদ করে নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। এর লক্ষ্য নেতিবাচক তাতে সন্দেহ নেই। এদের মতে, জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম নয়, স্বদেশি ও বিদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সংগ্রাম। প্রবাদ, জনশ্রুতি, লোককথা, গান ও কবিতা, ধর্মবিশ্বাস থেকে নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাসের উপাদন সংগ্রহ করা

Scanned with CamScanner

হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী ইতিহাস সংস্কৃতি, ভাষা, মিথ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে শোষণের স্বার্থে। এজন্য নিম্নবর্গের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি দলিল-দস্তাবেজের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতি সাবধানে প্রচলিত অপ্রচলিত সব সূত্র থেকে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে তথ্যসংগ্রহ করতে হয়। এডওয়ার্ড সাঈদ লিখেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সারা পৃথিবীতে যে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বৌদ্ধিক আন্দোলন হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হল সাবলটার্ন ইতিহাস। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা ও মননের ইতিহাস লেখেননি, ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, ইতিহাসের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। মোগল যুগ থেকে বিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত তাদের গবেষণার বিষয় করেছেন। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা অবশ্যই মার্কসবাদী, তবে মার্কসের সব তত্ত্ব নির্বিচারে অনুসরণ করা হয়নি। মার্কসের অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করে নীচুতলার মানুষের ইতিহাস রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। মার্কসের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসীদের দুঃখদারিদ্র্য ও বিদ্রোহী মনোভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্রোহ হল নিম্নবর্গের মানুষের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। কৃষক শুধু অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিদ্রোহ করে না, বিদ্রোহ করে যখন তার অভিযোগ প্রতিকারের সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। জমিদার, মহাজন, বণিক, দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুললে কৃষক বিদ্রোহের পথে পা দেয়। কৃষকের ধর্ম, কুসংস্কার, বিচ্ছিন্নতা এবং উচ্চবর্গ সম্পর্কে তার ধারণা চেতনা গঠন করে দেয়।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিখ্যাত নামগুলি হল ডেভিড আরনল্ড, জ্ঞান পাণ্ডে, দীপেশ চক্রবর্তী, শাহিদ আমিন, রামচন্দ্র গুহ, ডেভিড হার্ডিম্যান ও গৌতম ভদ্র। আরনল্ড অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ১৮৭৬-৭৮ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকরা নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কৃষকরা বাঁচার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। জ্ঞান পাণ্ডে অযোধ্যার কৃষক বিদ্রোহের আলোচনা করে জাতীয় আন্দোলনের ওপর এর প্রভাব দেখিয়েছেন। স্টিফেন হেনিংহ্যাম দেখিয়েছেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনের একটি স্বতন্ত্র স্তর ছিল, পাশে ছিল উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান। অরবিন্দ দাস দেখিয়েছেন ১৯৪৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিহারে যে কৃষক আন্দোলন হয় তার ফলে জমিদারি ব্যবস্থা উঠে যায়, এতে উচ্চবর্গের ভূমিকা ছিল না। এন. কে. চন্দ্র বর্ধমান জেলার ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। দীপেশ চক্রবর্তী কলকাতার পার্শ্ববর্তী চটকল শ্রমিকদের সাংগঠনিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী নেতারাও তাদের দুরবস্থার

জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। শাহিদ আমিন 'গান্ধী যখন মহাত্মা' প্রবন্ধে গোরক্ষপুর জেলার অশিক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর গান্ধির প্রভাব আলোচনা করেছেন। গান্ধি তার জীবদ্দশায় মিথে পরিণত হয়েছেন। ডেভিড হার্ডিম্যান গুজরাটের দেবী আন্দোলনের বর্ণনা দিয়ে কৃষক চৈতন্যের বিকাশের দিকটি তুলে ধরেছেন। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন বঙ্গভঙ্গ ছিল ভদ্রলোকের আন্দোলন, অসহযোগ ছিল নিম্নবর্গের মানুষের, আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন মনে করে নেতারা তা বন্ধ করে দেন। রামচন্দ্র গুহ কুমায়ুনের চিপকো আন্দোলনের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন অরণ্য নিয়ে বাণিজ্য শুরু হলে অরণ্যবাসী মানুষ অরণ্য বাঁচানোর জন্য আন্দোলন করেছিল। মালদার আদিবাসী জিতু সাঁওতাল জমিদার বিরোধী আন্দোলন করেন। গৌতম ভদ্র দেখিয়েছেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আসল নায়ক হলেন শাহমাল, দেবী সিংহ, গুণু ও মৌলবি আহম্মদুল্লাহ শাহ। এদের উচ্চবর্গের ইতিহাসে উপেক্ষা করা হয়েছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ লিখেছেন যে উচ্চবর্গের ইতিহাসে যা নেই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তা জুগিয়ে ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন। কাজটি মোটেই সহজ নয়, অনেক পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, নতুন নতুন দলিল-দস্তাবেজ খুঁজে বার করতে হয়। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন যে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করেছেন, জাতীয় ইতিহাস অনেকবেশি বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এদের গবেষণার মধ্যে ফাঁক-ফোকর আছে। নিম্নবর্গের কোনো পরিষ্কার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেননি। আদিবাসীদের বিদ্রোহকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাঁরা অন্য বিদ্রোহের গুরুত্ব কমিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে এলিট নেতৃত্বের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে থাকে। এই সত্যকে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা অস্বীকার করেছেন, উচ্চবর্গের নেতৃত্বের সমালোচনায় তাঁরা মুখর হয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করেছেন। স্ট্রাকচারালিজমের আঙ্গিক নির্বিচারে প্রয়োগ করতে গিয়ে এরা উচ্চবর্গের সংগৃহীত তথ্যকে হয় বাতিল করেছেন, নয় বিকৃত করেছেন।

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যার অনেক মিল আছে। জঙ্গিবাদী সব আন্দোলনকে এরা উজ্জ্বল করে চিত্রিত করেছেন, আবার বুদ্ধিজীবীদের সব আন্দোলনকে তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন। উচ্চবর্গের ইতিহাস যদি একপেশে হয়, তাঁদের ইতিহাসও একপেশে। এই ইতিহাসচর্চার অন্য ত্রুটি হল এদের বিষয় হল বিচিত্র, এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায় না। এরা দাবি করেছেন তাদের ইতিহাসচর্চার ভিত্তি হল মডার্নিজম ও পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম, এই দাবি আরো জটিলতা নিয়ে এসেছে। এধরনের ইতিহাসচিন্তায়

প্রগতি, আধুনিকতা, যুক্তিবাদ ও সমষ্টি প্রাধান্য হারায়। এঁদের ভালো দিক হল এঁরা ইতিহাসের ছাত্রকে বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, নতুন দৃষ্টি দিয়েছেন, নীচুতলা থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখার দৃষ্টি তৈরি হয়েছে। পুরোনো বিষয়কে এঁরা নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছেন। যেসব মানুষের ইতিহাস নেই, উপাদান নেই, অবহেলিত নির্যাতিত সেইসব মানুষের কথা বলে তাঁরা ইতিহাসচর্চায় ভারসাম্য ফিরিয়ে এনেছেন। ভারতের ইতিহাস অবশ্যই সমৃদ্ধ হয়েছে, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বর্ণময় হয়ে উঠেছে।

১১.৫ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এদেশের সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা দেখা দিতে থাকে। ভারতের ব্রিটিশ সরকার স্বদেশের পুঁজিপতিদের চাপে এদেশে যে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন তাতে এদেশিদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। ব্রিটিশ অর্থনীতির পরিপূরক হিসেবে ভারতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলা হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের বিস্তৃত বাজার এখানে গড়ে তোলা হয়। এদেশ থেকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের অপর্যাপ্ত পুঁজি চা, কফি, নীল, পাট, কয়লা ও পরিবহন শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। ব্রিটিশ রাজের নেতৃত্বে এদেশে শিল্পবিপ্লব হয়নি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চারও সম্প্রসারণ ঘটেনি। ব্রিটিশ শাসন এদেশে যে ভূমিব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে এদেশের কৃষক সমাজের দুর্দশা বেড়েছিল। ভারতের সর্বত্র কৃষকদের অত্যধিক ভূমিকর দিতে হত, ভূমিতে কৃষকের অধিকার ছিল অনিশ্চিত। জোতদার ও মহাজনরা জমির মালিক হয়ে বসেছিল, এদেশে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। কুটির বা হস্তশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃষকের বাড়তি আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে অন্তত বিশবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যাতে মারা গিয়েছিল অন্তত তিনকোটি মানুষ। ব্রিটিশ নেতৃত্বে এদেশে যে রপ্তানিমুখী হালকা শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল—চা, কফি, নীল, পাট—তাতে কাজ করত বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমিক। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এদের কম বেতন দিত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এরা কাজ করত, এদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। চা ও কফি বাগানগুলিতে শ্বেতাঙ্গ মালিকরা এদেশি শ্রমিকদের সঙ্গে প্রায় ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করত।

ভারতের সদ্যোজাত আধুনিক পশ্চিমি শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপটি ধরে ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকার যে এদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করবে না তা বুঝতে তাদের

Scanned with CamScanner